Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : প্রসঙ্গ ভাষাশৈলী

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	চন্দন আনোয়ার
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.11
Pages	১৭৭-১৯০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : প্রসঙ্গ ভাষাশৈলী

Check for updates

চন্দন আনোয়ার*

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নতুন গদ্যভাষা নির্মাতাদের মধ্যে হাসান আজিজুল হক অন্যতম। পরীক্ষা-প্রিয় কথাশিল্পী হাসান প্রায় প্রতিটি গল্প-উপন্যাসের গদ্যভাষা নিয়ে নতুন নতুন নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, স্বাভাবিক গতি ও বিন্যাসকে প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাষা নির্মাণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক গতিপ্রবাহের মধ্যেই তিনি নতুন অনেক সম্ভাবনা ও শক্তিকে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের অনন্য বিষয়-বৈচিত্র্য ভাষার নতুন শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগের রাজনীতি, দেশভাগ, দাঙ্গা, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর চারদশকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার বাঁক বদলের সাথে সাথে তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়-বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে, সেই সাথে পরিবর্তন এসেছে ভাষাশৈলীতে। তাই, তাঁর সমগ্র লেখকজীবনে বিষয় ও ভাষার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। সাবলীল ভাষা ও পরিমিত বাক্য ব্যবহার করে বক্তব্য উপস্থাপনে অনন্য দক্ষতার অধিকারী তিনি। শৈল্পিক নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততা তাঁর গদ্যভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ভাষারীতি প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক উদারনীতি গ্রহণ করেন। তাঁর কথাসাহিত্যে ভাষারীতিতে প্রমিত ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা সমান গুরুত্ব বহন করে। তিনি প্রমিত ভাষা ব্যবহারে নির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে চলার পক্ষপাতী, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার বিচিত্র ব্যবহার বিশেষ মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রমিত ভাষার তেমন হেরফের ঘটেনি, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রতিমুহূর্তে নিজের মতো করে নির্মাণ করে নিয়েছেন। বাংলার যে অঞ্চলের উপভাষাকে বর্ণনার বা সংলাপের ভাষা হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন না কেন, সেই ভাষার প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে নিজের মতো করে একটি ভাষাকাঠামো তৈরি করেন, যা সর্বজনবোধ্য।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

হাসান আজিজুল হক গল্প-উপন্যাসকে নিছক গদ্যের খেলা মনে করেন না। তাই তিনি কখনোই ভাষার বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে পাঠককে আটকে রাখার চেষ্টা করেননি। বাস্তববাদী লেখক হিসেবে তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে চরিত্র ও বিষয়ের যথাবাস্তব উপস্থাপনার দিকে। ভাষার ওপর অযৌক্তিক শক্তি প্রয়োগ করে অথবা ভাষার শরীরে অপ্রয়োজনীয় অলংকার চাপিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে-বাড়িয়ে রসালো করে উপস্থাপনের চেষ্টা তিনি বর্জন করে এসেছেন লেখালেখির শুরু থেকেই। বস্তুত, ভাষা প্রসঙ্গে শুচিবাই যেমন তাঁর নেই, তেমনি

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

অতি উৎসাহী হয়ে ভাষার আমূল সংস্কার করা বা পাল্টে ফেলাকেও সমর্থন করেন না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ভাষা একইসঙ্গে পরিবর্তনশীল ও রক্ষণশীল। ভাষা নতুনকে গ্রহণ করে কিন্তু পুরাতনকে সহজে ছাড়তে চায় না। ভাষার স্বাভাবিক গতিপ্রবাহকে থামিয়ে তাকে অতিমাত্রায় আলংকারিক বা পরিবর্তন করতে গেলে তা বিপজ্জনক বা আত্মঘাতী হতে পারে।

সাধারণত, সৃষ্টিশীল লেখককে নিজস্ব গদ্যভাষা নির্মাণ করতে কঠিন লড়াই করতে হয়। সৃষ্টিশীল লেখকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে চরম অস্থির হয়ে ওঠেন, একটির পর একটি নিজের তৈরি স্থাপনা ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন নতুন স্থাপনা তৈরি করেও স্বস্তি পান না। হাসান আজিজুল হককে এতটা রক্তারক্তি করতে হয়নি, কঠিন কোনো লড়াই করতে হয়নি বা নতুনভাবে রক্তক্ষরণ ঘটাতে হয়নি। নিজস্ব একটি গদ্যভাষা নির্মাণ করতে গিয়ে ভাষার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই যে লড়াইটুকু আছে, যে লড়াইকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা লেখকের নেই, সেই সহজাত লড়াইটাই তিনি করেন। ভাষার প্রকৃতিতে নির্ধারিত লড়াইয়ের বাইরে নিঃশব্দে ও নীরবে প্রতি মুহূর্তে ভাষার মধ্যে যে অন্তহীন পরিবর্তনগুলো ঘটে যাচ্ছে, সচেতন লেখক হিসেবে সেই পরিবর্তনগুলোকে ধরতে পারেন বলেই হাসান আজিজুল হকের পক্ষে নিজস্ব একটি গদ্যভাষা নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ভাষা তাঁর প্রধান লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার মাত্র। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন :

> ভাষা ব্যবহারের পেছনে আমার যে উদ্দেশ্য কাজ করে সেটা মনে হয় পরিষ্কার করাই ভাল। আমি কোনো কিছুকে ভাঙব বা একেবারে নতুনত্ব আনব বা কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাব—এভাবে কোনো জিদ করে কিন্তু লিখতে বসি না। আমি যে কাজটা করতে চাই সেটাই আমার মনের মধ্যে থাকে। নীলকণ্ঠ পাখির মতো একটা লক্ষ্য স্থির করে নেই।...আমার হাতে মজুদ যে বাংলা গদ্য আছে, তাকে কীভাবে ব্যবহার করলে আমার এই উদ্দেশ্যটা কীভাবে সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশিত হবে আমি সেটাই ভাবি। ভাষা ব্যবহারে আমার মূল মনোভাবটাই এটা। (শিবলী ও সৌভিক, ২০১১ : ২৪৬)

বিষয়ের ওজন বা মেজাজ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেন হাসান আজিজুল হক। তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্যের মতো ভাষাও বহুস্তরা, এবং নিয়মিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পর্বান্তর ঘটে। ভাষার এই পর্বান্তর নির্দিষ্ট কাল বা প্রবণতা ধরে হয়নি। তিনি জীবনের একটি মুহূর্তও লেখালেখি থেকে বিচ্যুত হননি। প্রায়শ দেখা যায়, একটি গল্প বা উপন্যাস লেখার পরে বিষয় ও ভাষার পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময় বিরতি দিয়ে তিনি লিখেছেন। বিষয় ও ভাষার ওপরে পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা করে তিনি লিখতে বসেন। এ কারণে, তাঁর গদ্যভাষা যেমন স্বচ্ছ, সাবলীল ও গভীর অর্থদ্যোতক, তেমনি গল্পের বিষয় বা অন্যান্য রূপ-কাঠামো পরস্পরপ্রবিষ্ট। নির্মাণের এমন অসাধারণ রসায়ন তৈরি সম্ভব হয়েছে তাঁর সময়, সমাজ, রাজনীতি ও দেশের সামগ্রিক পরিবর্তনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা, তীক্ষ্ণ ও গভীর অবলোকন শক্তি এবং লেখক হিসেবে নিজের দায়বোধের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার ফলে।

বাহুল্যকথন বর্জন করে সংযত আবেগে পরিমিত বক্তব্য উপস্থাপনরীতির সাধনায় হাসান আজিজুল হকের সাফল্য শিখরস্পর্শী। অল্পকথন, পরিমিতিবোধ ও মিতব্যয়িতার ভেতর দিয়ে লেখকের ব্যক্তিক অনুভব ও শিল্পীর নান্দনিকতাবোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো তাঁর শিল্প-সাধনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একমাত্র কমলকুমার মজুমদার ছাড়া তাঁর সমতুল্য

দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে খুব কম। একটি বাক্য, এমনকি একটি শব্দ প্রয়োগেও তিনি কবির মতোই ভাবেন। কঠিন পরিমিতিবোধ সত্ত্বেও তাঁর বিষয় ও চিন্তার বৈচিত্র্য এত বিপুল। মাত্র সত্তরটির মতো গল্প ও দুটি পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন দীর্ঘ ষাট বছরের লেখকজীবনে, কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। অসহযোগ আন্দোলন, দেশভাগের রাজনীতি, দুর্ভিক্ষ থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তবতার পাশাপাশি সমাজের অন্তর্নিহিত ক্লেদ, বৈষম্য, ক্ষোভ, মানবীয় প্রেম, মৃত্যু ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর আখ্যানবিশ্ব। রচনার পরিমাণ নয়, বিষয়ানুযায়ী ভাষা, শব্দ, বাক্যের গভীরতার মধ্যেই হাসান আজিজুল হকের ভাষারীতি অনন্য হয়ে ওঠে।

শৈল্পিক নিরপেক্ষতা ও নিরাসক্তি যে কোনো স্রষ্টার একটি বিরাট গুণ। হাসান আজিজুল হকের গদ্যের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্লিপ্ততা। বিষয়ের উপরে দখলদারিত্বের জোরে গল্পের বিষয়-বিন্যাস ও নির্মাণ-কৌশলের প্রতিটি পর্যায়ে অত্যন্ত নির্মোহ ও নিরপেক্ষ একটি অবস্থান গ্রহণ করতে তিনি পারেন। প্রতিটি গল্প লেখার পূর্বে এই অবস্থান তৈরির জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতিও তিনি গ্রহণ করেন। বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য, লেখক হিসেবে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও পাণ্ডিত্যকে অক্ষুণ্ন রাখে এমন ভাষা ব্যবহারের জন্য তিনি যে দীর্ঘ শ্রম ও সময় ব্যয় করেন তার সমতুল্য দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। দেবেশ রায়ের ভাষ্যে, 'হাসান ভাই প্রসঙ্গে নির্লিপ্তি সাধনের একটা তারিফ আছে।' (দেবেশ, ২০১১ : ৪৫) তাঁর এই অসামান্য নির্লিপ্ততার গুণেই জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত জীবনবাস্তব জীবনের চেয়েও বাস্তব একটি রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে আসে। নিজের উপস্থিতিকে আড়াল করার সহজাত ক্ষমতা আছে এই কথাশিল্পীর। তাঁর গল্প-উপন্যাসে খুব কম বিষয় আছে যার সাথে তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। তারপরেও দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা মুক্তিযুদ্ধের মতো বিষয়ে তিনি আশ্চর্যরকমভাবে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত। গদ্যভাষাকে নিরাসক্তির একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে তিনি গড়ে তুলেছেন। *আগুনপাখি* উপন্যাসে কথক নারীর সঘন আবেগ, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ও বিষাদাত্মক বাস্তবতা এবং প্রবহমানতায় নিজেকে না হারিয়ে দেশভাগ প্রত্যাখ্যানের যুক্তি, স্পর্ধা ও দার্ঢ্য ভাষা পেয়েছে লেখকের নির্লিপ্ততার শক্তির জোরে। দৃষ্টান্ত :

> আমি ক্যানে তোমাদের সাথে দেশান্তরি হব এই কথাটি কেউ আমাকে বুঝইতে পারে নাই। পেথম কথা হচে, তোমাদের ঝি একটু আলেদা দ্যাশ হয়েছে তা আমি মানতে পারি না। একই দ্যাশ, একই রকম মানুষ, একই রকম কথা, শুদু ধম্মো আলেদা সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটু জায়গা থেকে আলেদা আর একটু দ্যাশ হয়ে গেল, ই কি কুনোদিন হয়? এক লাগোয়া মাটি, ইদিকে একটি আমগাছ, একটি তালগাছ, ওদিকের তেমনি একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল? কই ঐখানটোয় আসমান তো দু রকম লয়। শুদু ধম্মোর কথা বলো না বাবা, তাইলে পিথিমির কুনোদ্যাশেই মানুষ বাস করতে পারবে না। (হাসান, ২০০৬ : ১৫৬)

দেবেশ রায়ের মতে, গল্পলেখক যখন তাঁর ভাষা দিয়ে নিজেকে চিনে ফেলতে শুরু করেন তখন থেকে শুরু হয় তাঁর সর্বনাশের। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি কল্লোলযুগের লেখকদের প্রসঙ্গে

বলেন, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষাটাকেই একমাত্র আধুনিক মনে করার কারণে প্রতিভা থাকার পরেও সকলে মিলে একটি ভালো গল্প লিখতে পারেননি। ভাষা-ই গল্পকারের বাঁচা-মরা নির্ধারণ করে। তাকে নতুন ভাষা তৈরি করতে হয় এবং সেই ভাষা আবার ভুলেও যেতে হয়। (দেবেশ, ২০০৩ : ১৪১) হাসান আজিজুল হক তাঁর প্রতিটি গ্রন্থে তো বটেই, প্রায় প্রতিটি গল্প-উপন্যাসে ভাষার নতুনত্ব এনেছেন অথবা আনার চেষ্টা করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট একটি ভাষা তৈরি করে গল্পটি লেখা শেষ হলে নিজেই সেই ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন আর একটি গল্পভাষা খোঁজেন। এই নতুন ভাষা অন্য একটি নতুন গল্পের ভাষা হয়। সম্ভবত, হাসান আজিজুল হক বাংলা সাহিত্যের সেই বিরল কথাশিল্পী, যাঁর সমগ্র লেখক জীবনে ভাষা ও বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। তিনি নিজের গল্পভাষার চোরাবালির ফাঁদে কখনো পা দেননি। বাংলা ভাষার অভ্যন্তরের অনন্ত সম্ভাবনাকে নিজের সৃষ্টির কাজে লাগাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন বলেই বিষয় ও ভাষার পুনরাবৃত্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা সম্ভব হয়।

লেখকের অভিজ্ঞতাকেই ধারণ করে বেঁচে থাকে ভাষা। নির্দিষ্ট ধ্বনি ও শব্দের সমন্বয়ে ভাষা পাঠক-লেখকের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের একটি প্রতীকী মাধ্যম মাত্র। এই সীমাবদ্ধ মাধ্যমটি ব্যবহার করেই লেখককে তাঁর অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে হয়। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাই সাহিত্যের একমাত্র বিষয়। প্রকৃতিগতভাবেই ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা সীমিত। সীমিত ধারণক্ষম ভাষায় লেখকের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার চাষাবাদ করতে গিয়ে প্রায়শ ভাষাকে সাংকেতিক বা প্রতীকময় করে তুলতে হয়। অভিজ্ঞতাকে প্রতীকায়িত করার ক্ষমতা নির্ভর করে লেখকের কল্পনাশক্তির উপরে। অভিজ্ঞতা আদিতে যাই থাককু না কেন, তাকে শিল্পায়িত করার সময় লেখককে কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করতে হয় এবং কল্পনা হিসেবেই ভাষায় তা সঞ্চার করতে হয়। হাসান আজিজুল হক তাঁর অভিজ্ঞতার শিল্পায়নের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভাষার যথাযথ ব্যবহারের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তাঁর নিজের কথায়, 'আমি কেবল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বোধ ও উপলব্ধিতে যা প্রস্তুত আছে, একমাত্র তাকে নিয়েই লিখতে পারি। একটা জিনিসও আমি উদ্ভাবন করতে পারি না। সেদিক থেকে লেখক হিসেবে আমার উদ্ভাবনী শক্তি শূন্য।' (শহীদুল, ২০১১ : ২১৭) ভাষার শরীরে অসাধারণ শক্তির একমাত্র ক্ষেত্রই হচ্ছে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সামাজিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষ তার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছবে, সে চারদিক থেকে মুক্ত থাকবে, জীবন সম্পর্কে এই মহৎ ধারণাকেই তিনি শিল্পায়িত করতে চান। চিন্তার এই বিশালত্বকে ধারণ করতে গিয়ে তাঁর গদ্যভাষা হয়ে ওঠে সর্বংসহা। জীবন থেকে উত্থিত ভাষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাহিত্য-নির্মাণ তিনি কখনোই করেননি। প্রসঙ্গত সনৎকুমার সাহার মন্তব্য স্মরণ করা যায়,

> হাসান তার জন্য তৈরি করেছেন ভাষার আলাদা এক পরিমণ্ডল। গভীর গম্ভীর মন্ত্রের মতো পাঠকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। যদিও তা উঠে আসে অভিজ্ঞতার বহু পরিচিত বৃত্ত থেকেই। জীবন থেকে উৎসারিত হয়ে জীবনেরই এক স্থায়ীরূপ তা তুলে ধরে। ধ্রুপদ গানের মতো তার চাল। এবং সেই রকমই তার মন্দ্রিত বৈভব। (সনৎকুমার, ১৩৯৫ : ১০৬)

প্রমিত ভাষার ব্যবহার

হাসান আজিজুল হক মানভাষা বা প্রমিত ভাষা ব্যবহারের নির্দিষ্ট মানদণ্ড বা শৃঙ্খলা মেনে চলার পক্ষে। পৃথিবীর সকল ভাষার প্রমিত রূপই কৃত্রিম। দীর্ঘকালের পরিচর্যা-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্রমিত ভাষার একটি সাংগঠনিক রূপ তৈরি হয়। প্রধানত, কল্লোলযুগ থেকেই কথাসাহিত্যের ভাষায় ঘরোয়া কথ্যরীতির ব্যবহার চলে আসছে। হাসান আজিজুল হক প্রথম গল্প থেকেই সহজ শব্দে ভাষার এই ঘরোয়া কথ্যরীতি ব্যবহার করে আসছেন। প্রথম দুটি গ্রন্থের সবকটি গল্পে বিবৃতির ভাষা এবং মানভাষায় লিখিত সংলাপের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই অর্থাৎ সহজ শব্দে ঘরোয়া কথ্যরীতিতে লেখা। তাঁর গদ্যের বাঁধন অত্যন্ত ঘনবদ্ধ, অলংকারবহুল, ধারালো, দ্রুত সঞ্চরণশীল ও অনেকাংশে রূপকাশ্রয়ী। মানবভাগ্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের শিল্পিতরূপ "আমৃত্যু আজীবন" গল্পের ভাষা অনেকাংশে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

হাসান আজিজুল হক তাঁর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *জীবন ঘষে আগুন*-এ পূর্বের দুটি গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার সারল্য ও সহজবোধ্যতা থেকে সরে এসে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য ঘটিয়ে তাঁর গদ্যভাষাকে প্রাচীন রূপ দিতে চেয়েছেন। বিষয়কে বাস্তবরূপ দেবার প্রয়োজনে বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপটিকেই এ পর্বে আদর্শ বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কমলকুমার মজুমদারের *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসের গদ্যভাষার সাথে তুলনা করা হয়। এই তুলনায় যেটুকু মিল পাওয়া যায় তা কাকতালীয়। কারণ, *জীবন ঘষে আগুন* যখন লেখেন তখনো পর্যন্ত তিনি *অন্তর্জলী যাত্রা* পড়েননি। দুটি রচনা থেকে নিচে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায় :

> *অন্তর্জলী যাত্রা* : ক্রোধ হইতে কাম সঞ্জাত হইল (!), দিক সকল তমাচ্ছন্ন, তিনি এহেন ঘনঘটায় একাকিনী, আপনার সুদীর্ঘ অন্তরীক্ষে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন, আপনার আয়ত্তের বহির্ভূত হইলেন। পলাশের উষ্ণতা এখানে নিঃশেষিত বিকারগ্রস্ত হইবেক, বহুধা ধমনীর মধ্যে কখনও সুর হাস্য খিলখিল করিয়া উঠিল, এখন স্ফীত হয় : সুন্দর সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় ঊর্ধ্বে চিত্তশরীরে উঠিয়া সৌরজগতে পথ হারাইল। (কমলকুমার, ১৩৮৫ : ৫৮)
>
> *জীবন ঘষে আগুন* : যদিচ অন্ধকার অধিক ছিল না — তার কারণ, ক্ষণিকের মধ্যেই কিছু দুঃসাধ্য প্রয়াসে আলোর শিখাটি নিবাত নিষ্কম্প, তথাভূত অন্ধকার জালিকাটা নকশা ও অলঙ্কারবহুল এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত এবং ঈদৃশ খণ্ডগুলি শিকারী বিড়ালবৎ সুযোগসন্ধানী গোঁফ ফোলানো — যেন নিঃশব্দে কালীর বিভিন্ন অঙ্গে লম্ফ প্রদান করে। কিন্তু তাতেই কিই বা যায় আসে; অচিরেই যে ঘরের বন্ধুর বায়ুতে সঘন নিঃশ্বাস বাজে, কোনো বিকট ছায়া মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয় — বিপরীত দুটি হাত এমনি মুষ্টিবদ্ধ যে কণ্ঠের অজস্র শিরায় নির্মম টান পড়ে — দুই দন্তপঙ্‌ক্তি পরস্পরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায় — একটি মাংসের শরীর শুকনো কাষ্ঠে পরিণত হয়। (হাসান, ১৯৭৩ : ৭৭)

বিষয়গত পার্থক্য তো আছেই, তাছাড়া কমলকুমার মজুমদারের ভাষার তুলনায় হাসান আজিজুল হকের ভাষা সহজেই বোধগম্য এবং চেষ্টা করলেই তাকে সরলীকরণ বা সাবলীল করা সম্ভব। কিন্তু কমলকুমারের ভাষা এমনি দুর্বোধ্য, কঠিন ও উৎকট ব্যক্তিত্বের সিলমোহর মারা যে, একে সরলীকরণ বা সাবলীল করা প্রায় অসম্ভব। এছাড়া কমলকুমারের গদ্যে কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করার একটা প্রবণতাও আছে। তাঁর গদ্যভাষা

শীতল। এই গদ্যের মেজাজই এমন যে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মুহূর্তেও তা শান্ত থাকতে প্রেরণা যোগায়। বিপরীতে, সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াকু শব্দসৈনিক হাসান আজিজুল হকের গদ্যভাষা দুর্বিনীত, বিস্ফোরণমুখী, অগ্নিময়। উপরের দৃষ্টান্তে যেটুকু মিল লক্ষণীয় তা একান্তভাবে উপরিতলের। অন্তর্ময় বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে কমলকুমার মজুমদারের জটিল ও রহস্যময় গদ্যভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে হাসান আজিজুল হকের গদ্যভাষা।

হাসান আজিজুল হকের গদ্যভাষায় দ্বিতীয়বারের মতো পর্বান্তর ঘটে *নামহীন গোত্রহীন* গল্পগ্রন্থে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও তার অল্প পরে লেখা গল্পগুলোতে রূপক-অলংকার-সাংকেতিকতা বর্জিত প্রায় নিখাদ স্বচ্ছ ঝরঝরে সাদামাটা একটি ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি। *জীবন ঘষে আগুন*-এর গদ্যরীতি থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে সরে এসেছেন তো বটেই, প্রথম ও দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের গদ্যরীতি থেকেও প্রায় সরে এসেছেন। মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর এসব সাধারণ মানুষের ত্যাগ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মতো ঐতিহাসিক ও অনুভূতিপ্রবণ বিষয়কে উপস্থাপনের জন্য হাসান আজিজুল হক এই গ্রন্থের ভাষাকে সরল থেকে সরলতর করে নিয়েছেন। বিষয়কে স্পষ্ট করে প্রকাশের জন্য এই ভাষা অত্যন্ত কার্যকর ও লক্ষ্যভেদী। সারল্যই এই ভাষার প্রধান ভূষণ। "কেউ আসে নি" গল্প থেকে দৃষ্টান্ত :

> রাইফেল কাঁধে নিয়ে সে শহরের ভিতরে একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে বসে ছিলো। সত্যিই, পয়সা তার তখনো ছিলো। রেস্তরাঁটায় লোকের ভিড় ছিলো খুব। কিন্তু গফুর একটাও চেনা লোক দেখতে পেল না। কেউ এসে তার সঙ্গে কোনো কথা বললো না। দুএকজন কেমন ভয়ে ভয়ে তার পোশাক আর রাইফেলটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো। পয়সা গুণে নেবার সময় রেস্তরাঁর মালিক তার দিকে একবারও তাকালো না। (হাসান, ১৯৭৫ : ৮১)

ভাষারীতির এই ধারা হাসান আজিজুল হকের পরবর্তীকালে লেখা অনেকগুলো গল্পে বজায় থাকলেও সব গল্পে থাকেনি। পঞ্চম গল্পগ্রন্থ *পাতালে হাসপাতালে*-এ প্রথম দুটি গল্পগ্রন্থের মতো ভাষাকে আলংকারিক বা সাংকেতিক করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। 'নামহীন-গোত্রহীন'-এর ভাষার মতো এতটা সরলরৈখিক ও অলংকারবর্জিত না হলেও পরের লেখাগুলোতে ভাষাকে আর কখনোই *জীবন ঘষে আগুন*-এর মতো প্রাচীন বা "আমৃত্যু আজীবন"-এর মতো রহস্যময় করেননি তিনি।

আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

লেখক যেখানে নিজের শ্রেণিগত ভাষা ব্যবহার করেন সেখানে তাঁর বিশেষ কিছু করার সুযোগ থাকে না। কথাসাহিত্যের বৈচিত্র্য আসে সৃষ্ট চরিত্রের মুখের ভাষার ওপর ভিত্তি করে। চরিত্র বা অঞ্চলবিশেষে ভাষার যে বৈচিত্র্য সেখানেই নিহিত আছে ভাষার অনন্ত সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে যে যত বেশি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন তিনি তত বড় কথক। ভাষা আঞ্চলিক হলেও লেখকের সার্বজনীন চিন্তাকে ধারণ করতে হয়। পাঠকের মনোজগতকে স্পর্শ করতে লেখককে অত্যন্ত সচেতনভাবে ভাষা নির্বাচন ও ব্যবহার করতে হয়। সুকৌশলে বিন্যাস করতে হয় বলে আঞ্চলিক ভাষার হুবহু অনুকৃতি সম্ভব নয়।

আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ অর্থ থেকে মুক্তি দিয়ে ভাষাকে সর্বগ্রাহ্য করে তুলতে গিয়ে প্রত্যেক সৃজনশীল লেখককেই কম-বেশি সমঝোতা করতে হয়। লেখক বিশেষ অঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজে একটি ভাষা তৈরি করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাস কোথাও হুবহু মুখের ভাষা নেই। এই ভাষা মানিক নিজে তৈরি করে নিয়েছেন। সুশীল সাহাকে লিখিত এক পত্রে হাসান আজিজুল হক নিজের অভিমত জানান—'সাহিত্যের আঞ্চলিক ভাষাও নির্মিত এবং সেই কারণেই কিছুটা কৃত্রিম। সবচেয়ে বড়ো কথা 'intonation' বাদ দিয়ে আঞ্চলিক কথ্য অর্থহীন এবং লেখার অক্ষরে 'intonation' দেবার কোনো উপায় নেই। সেই জন্য আঞ্চলিক কথ্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তুললেই চলে।' (সুশীল, ২০১২ : ৩১৩)

হাসান আজিজুল হকের কথাবিশ্বের অধিকাংশ চরিত্রের ভাষা-ই আঞ্চলিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *আগুনপাখির* বর্ণনাদানকারী প্রধান চরিত্রের ভাষা আগাগোড়া আঞ্চলিক। তাঁর আঞ্চলিক ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে অর্থের অস্পষ্টতা বহন করে না। আঞ্চলিক ভাষাকে কখনোই তিনি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেননি। স্থান, কাল ও চরিত্রের গুরুত্বকে সমভাবে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করার দিকেই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। আবার একইভাবে আঞ্চলিক ভাষার অকৃত্রিম চরিত্রকে তিনি কখনোই ক্ষুণ্ন হতে দেন না। কোনো একটি আঞ্চলিক ভাষার ধাঁচে ফেলে খেয়ালখুশি মতো এমন কোনো শব্দ বা টান ব্যবহার করেন না, যে শব্দ বা টান ওই অঞ্চলের ভাষাতে নেই। বস্তুত, বিশেষ ভাষার মেজাজ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে লেখক আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ ধাঁচকে ব্যবহার করেন মাত্র; ইংরেজিতে যাকে বলে dialect বা 'ভাষার আঞ্চলিক রূপ'। প্রাদেশিকতামুক্ত মার্জিত আঞ্চলিক ভাষা উপস্থাপনার কারণেই মূলত বাংলাদেশের পাঠকের কাছে স্বল্প পরিচিত বা সম্পূর্ণ অপরিচিত উপভাষায় লেখা হাসান আজিজুল হকের গল্প-উপন্যাস জনপ্রিয় ও সর্বজনপাঠ্য হয়েছে।

হাসান আজিজুল হকের সমগ্র সৃষ্টিকর্মে মধ্যবিত্তের দ্বারা ব্যবহৃত মার্জিত আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। পরিবর্তে নামপরিচয়হীন নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ভাষাই তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতিনিয়ত প্রতিকূল বাস্তবতার সঙ্গে লড়তে হয় বলে তাদের ভাষাও আবরণহীন, নির্মেদ ও খটখটে। এমনকি প্রেম, ভালোবাসা বা সন্তান-বাৎসল্যের মতো আবেগ ও অনুভব উৎসারিত ভাষার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। শালীন-অশালীন বা নান্দনিকতার প্রসঙ্গ অবান্তর তাদের কাছে। নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষেরা সরল বাক্য প্রয়োগ না করে প্রায়শ শ্লোক, প্রবাদ, প্রবচন, উপমা, ছড়া ইত্যাদি অলংকার মিশিয়ে ভাষাকে শানিত করে। এই প্রবণতা তাদের সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে হাসান আজিজুল হকের তুল্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের সাহিত্যে কেন, সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যেই বিরল। ব্যবহার বৈচিত্র্যের দিক থেকে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অতিক্রম করে গেছেন। ব্যক্তিজীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ভূগোল বারবার পরিবর্তনের কারণে হাসান আজিজুল

হকের লেখার ভূগোলও পাল্টে গেছে। ইংরেজ শাসনাধীন অখণ্ড ভারতবর্ষে জন্ম ও শৈশব কাটানো, ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পরে ভারতের নাগরিক হিসেবে কৈশোর, অতঃপর দেশান্তরি হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যৌবন এবং পরিণত বয়সে বর্তমান বাংলাদেশে বসবাস করার মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হকের জীবন অতিবাহিত হয় চারটি রাষ্ট্র-কাঠামোয়। জীবন-বিন্যাসের এই ভূগোলের কারণেই তাঁর গল্প-উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার এই বৈচিত্র্য। এ প্রসঙ্গে আবু জাফরের মন্তব্যটি স্মরণ করা যায় :

> বয়সের দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসানের চেয়ে তিরিশ বছরের বড়ো হলেও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে হাসান যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা মানিকের তুলনায় যেমন বহু বিচিত্র, তেমনি পাশবিকতার দিক থেকে লোমহর্ষক। (আবু জাফর, ১৯৯৬ : ১৯)

রাঢ়বঙ্গের ভাষা

জন্মগতভাবে প্রত্যেক লেখকের ভাষার একটি ভিত থাকে, সেই ভিতটিই লেখকের নিজস্ব গদ্যভাষা নির্মাণের প্রধান রসায়ন। হাসান আজিজুল হকের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশেষ ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। তাই, হাসান আজিজুল হকের কথাবিশ্বে রাঢ় অঞ্চলের ভাষার প্রাধান্য বাস্তবতাপ্রসূত। দেশভাগ তাঁর সমস্ত কিছু কেড়ে নিলেও মুখের ভাষাটি কেড়ে নিতে পারেনি। ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসে রাঢ়ী উপভাষায় দেশভাগকে বিষয় করে লেখেন *আগুনপাখি* উপন্যাস। প্রধান চরিত্র নিজের মায়েরই প্রতিমূর্তি, অন্য সব চরিত্রই তাঁর পরিবার পরিমণ্ডলের অথবা গ্রাম-পরিমণ্ডলের। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'উপন্যাস শেষ পর্যন্ত ভাষা — আগুনপাখি উপন্যাসের বাস্তব অনেকটাই ভাষার বাস্তব।' (পার্থপ্রতিম, ২০০৯ :৭)

*আগুনপাখি*তে ঔপন্যাসিক দেশভাগের রাজনীতির ভয়াবহতাকে একটি সামগ্রিক রূপ দিতে চেয়েছেন। এ কারণে, মধ্যবিত্ত একটি পরিবারকে কেন্দ্রে স্থাপন করে কাহিনি চারদিক ছড়িয়েছেন। যে নারীর জবানিতে গল্প লিখছেন, সেই নারী তার নিজের বর্গের ভাষাতেই কথা বলে। সমগ্র উপন্যাসে তিনি রাঢ় অঞ্চলের মধ্যবিত্তের আঞ্চলিক ভাষা-কাঠামো ব্যবহার করেন।

উপন্যাসের কাহিনিতে আগাগোড়া ভাষার আঞ্চলিকতা সমতলিক নয়। কথক চরিত্রের প্রথম দিকের ভাষার তুলনায় শেষের দিকে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার কমে এসেছে। ভাষার বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন ছাড়াও ভিতরের শক্তিতে পার্থক্য ঘটে গেছে। লেখক যেন ভাষার কর্তৃত্ব কথক চরিত্রের কাছ থেকে নিয়ে নিতে চাইছেন। শেষের দিকে, কাহিনি যখন রাজনৈতিক জটাজালে আটকে পড়ছে আর লেখকের বিষয়-বক্তব্য স্পষ্ট হচ্ছে, তখনি ভাষা আঞ্চলিকতার পরিবর্তে প্রমিত হবার দিকেই বেশি মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে। কাহিনির শেষের দিকে লেখকের সমস্ত মনোযোগ বিষয়ের উপরে পড়েছে বলে রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষার বিশেষ সুরেলা টান কমে এসেছে। কিন্তু শেষের দিকে বিষয়-বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য ভাষা আরো ধারালো, তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী হয়েছে। এ কারণে, ভাষার বাইরের পার্থক্য তেমন স্পষ্ট না হলেও ভিতরের পার্থক্য স্পষ্ট। দুটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

১. আমাকে সে সারা জেবন হেনস্তা করেছে, কতো কুবাক্যি বলেছে, হাত ধরে ঘর থেকে বার করে দিতে চেয়েছে, তবু আমার মনের ভেতরে ঠিকই জানি কি সনমান সে আমাকে দিয়ে গেয়েছে। কিন্তুক সে শুদু ভেতরে ভেতরে, নাইলে তামাম লোকের ভালো করবে, শুদু আমার দিকে চেয়ে দেখবে না। (হাসান, ২০০৬ : ১৮)

২. মানুষ কিছু লাগি কিছু ছাড়ে, কিছু একটা পাবার লেগে কিছু একটা ছেড়ে দেয়। আমি কিসের লেগে কি ছাড়লম? অনেক ভাবলম। শ্যাষে একটি কথা মনে হলো, আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারো অবাধ্য হই নাই। আমি সবকিছু শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। (হাসান, ২০০৬ : ১৫৮)

গল্পের ভাষায় যেমন উপমা-অলংকারের ব্যবহার দেখি, *আগুনপাখি* উপন্যাসের ভাষায় তেমনটা নেই বললেই চলে। দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ ও দেশান্তরির মতো মর্মান্তিক ইতিহাসকে বিষয় করে উপন্যাস লিখতে গিয়ে রাঢ় অঞ্চলের ভাষার ধাঁচটাকে ব্যবহার করে আঞ্চলিক বাতাবরণে সরল একটি গদ্যভাষা লেখক তৈরি করে নিয়েছেন। এই ভাষার লালিত্য ও ধারণক্ষমতা বিপুল। একইসঙ্গে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাষ্য নির্মাণ ছাড়াও নারীত্ব ও ব্যক্তিত্বকে ধারণক্ষম এ ভাষা। অসম্ভব রকমের একটি মায়াময় টান গদ্যের অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দেশভাগ ও সমসাময়িক ঘটনাবলি কেন্দ্রিক জীবনের গভীরতর অনুভব, ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্গত ক্রোধ, প্রতারণা ও প্রত্যাখ্যানের মতো বিষয়গুলোকে এত বছর পরে জান্তব ও বাস্তবভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখক যে গদ্যভাষা বেছে নিয়েছেন, তা বাংলা কথাসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। হাসান আজিজুল হকের মতোই রাঢ়ের আরেক সন্তান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সমস্ত জীবন ধরেই রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষায় গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তাঁর গদ্যভাষায় হাসান আজিজুল হকের গদ্যভাষার মতো এত বৈচিত্র্য নেই। একই ধাঁচের গদ্যভাষা তিনি প্রায় সারাজীবন ব্যবহার করে গেছেন। হাসান আজিজুল হক রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে নতুন নতুন সম্ভাবনা খুঁজেছেন। একই রাঢ়ের ভাষা "শকুন"-এ যে রূপে উপস্থিত, "জীবন ঘষে আগুন"-এ তার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত। বস্তুত, রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষার প্রাণশক্তি ও চলৎশক্তিটাকে হাসান আজিজুল হক সঠিকভাবে ধরতে পারেন বলেই এর অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন।

হাসান আজিজুল হকের উপন্যাসের চেয়ে গল্পের ভাষা অধিকমাত্রায় আঞ্চলিক। তাঁর প্রথম গল্প "শকুন" লিখেছেন রাঢ়ী উপভাষায়। সমস্ত গল্পেই প্রায় রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষায় ছোট ছোট বাক্যে কথা বলে চরিত্ররা। ফাঁকে ফাঁকে অল্প কিছু জায়গায় প্রমিত ভাষার বিবৃতি দিয়েছেন লেখক। আঞ্চলিক ভাষাকে মার্জিত ও সর্বজনবোধ্য করার বিষয়ে তিনি প্রথম থেকেই অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। বলা চলে, প্রথম গল্পেই তিনি নিজস্ব একটি ভাষা ও একটি নির্মাণ-পথ তৈরি করে ফেলেন। এ প্রসঙ্গে শচীন দাশের মন্তব্য :

এ ভাষাই থেকে গেছে প্রতিটি গল্পের নতুন শৈলীতে। এ ভাষা অনুকরণ করা যায় না। এটা অর্জন করতে হয়, যা হাসান আজিজুল হক অর্জন করতে পেরেছিলেন জীবনের শুরুতেই।...মনে হয় তাঁর চরিত্ররাই এ ভাষা নিজেরা তৈরি করে তা আখ্যানকারকে উপহার দিয়েছেন। (শচীন, ২০১২ : ৬৫)

প্রথম গল্প "শকুন" ছাড়াও প্রথম গল্পগ্রন্থ *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য*-এর "তৃষ্ণা", "একজন চরিত্রহীনের পক্ষে", "মন তার শঙ্খিনী" এবং দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *আত্মজা ও একটি করবী গাছ*-এর "পরবাসী" এবং তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *জীবন ঘষে আগুন*-এর "জীবন ঘষে আগুন" গল্পের সংলাপে তিনি রাঢ়ের লোকভাষা ব্যবহার করেছেন। এই ভাষার বিশেষ ধরনের টান, সুর বা ঝোঁক তাঁর চরিত্রের সংলাপে অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। রাঢ়ী উপভাষার স্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত ঐতিহ্য বাংলার অন্য যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে আলাদা। হাসান আজিজুল হকের গল্পে স্থানের ব্যবহার প্রায় নেই, কিন্তু একটিমাত্র সংলাপই যথেষ্ট রাঢ়ের ভাষা চিনে নেওয়ার জন্য।

রাঢ়ের কথ্যভাষায় আদিবাসী বা অনার্য প্রভাব সর্বাধিক। সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, ডোম, খেড়িয়া, শবর ইত্যাদি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আদিনিবাস হওয়ায় রাঢ়ের কথ্যভাষায় অস্ট্রিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিপুলভাবে পড়েছে। হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্প-উপন্যাসে রাঢ়ের আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক রূপটিকে ব্যবহার করেন। একমাত্র "জীবন ঘষে আগুন" গল্পের বিষয়-বাস্তবতার কারণেই তিনি রাঢ়ের আদিম ভাষারীতি ব্যবহার করেন। বাগদি যুবক মনোহর ও মস্তাজের সংলাপটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায় :

> ক্যা জানে মোরা ইর পর কি করব, আঃ গঁ—মোদের পেটের মধ্যে জ্বালা, ঢ্যামনা বাবুরা মোদের উপোষী মেয়েমানুষ — খিদেয় মানুষ ফাঁসি যায় — লিজেরা লিজেরা লটকায় গাছের ডালে — সোনার পুত শুকিয়ে মরে বটে — এই কথায় মস্তাজ বলে, আঃ মনা, মানুষ না মেরে মানুষ বাঁচে লিকিন? মানুষ কুকুর হলছে — সি মানুষ মারলে কুকুর মরে। (হাসান, ১৯৭৩ : ৯৭)

রাঢ় ভূখণ্ডের অন্ত্যজ বাগ্‌দি জনগোষ্ঠীর যূথবদ্ধ ক্রোধ, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন বলে ভাষার এই প্রাচীন রূপটিকে গ্রহণ করেছেন। কায়েস আহমেদের সাথে আলাপচারিতায় লেখক বলেন :

> এ গল্পে আমি সমগ্র রাঢ়, তার নিঃসর্গ, তার সংস্কৃতি, সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনকে ধরে রাখতে চেয়েছি এবং এর আদিম আলো-আঁধারিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য সেই সময় আমার মনে হয়েছিল বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপটি এর জন্য আদর্শ হবে।' (কায়েস, ২০১১ : ৬৪)

দক্ষিণবঙ্গের ভাষা

রাঢ়ের লোকভাষার পরে হাসান আজিজুল হকের গল্পে খুলনার লোকভাষা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আরো নির্দিষ্ট অর্থে বললে, বর্ধমান ছেড়ে খুলনার যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন তিনি, সেই ফুলতলা ও নিকটবর্তী যশোরের নোয়াপাড়া অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাকে তাঁর গল্পের চরিত্রের মুখে ব্যবহার করেছেন। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি রাঢ়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাঢ়ের রুক্ষ, ধূলি-ধূসর-তপ্ত মরুভূমিতুল্য ভূ-প্রকৃতির বিপরীতে দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সবুজ ও মাটি বৃষ্টিবিধৌত উর্বর। লেখকের ভাষায় 'রাঢ়ের মানুষের চোখ যেন সবসময়ই রক্তবর্ণ, সূর্য সেখানে বদমেজাজি আর এখানে চোখের জন্য কি

অপরূপ দৃশ্য।' (হাসান, ১৯৮৬ : ৫৩) ভূ-প্রকৃতির পার্থক্যের কারণে খুলনা অঞ্চলের ভাষা রাঢ়ের মতো কঠিন ও অলংকারবহুল নয়। খুলনার ভাষায় সারল্য আছে।

তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি গল্প "আত্মজা ও একটি করবী গাছ" এবং "আমৃত্যু আজীবন"-এর আখ্যানে তিনি খুলনা অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন। এছাড়া "মারী", "শোণিত সেতু', "ভূষণের একদিন", "কৃষ্ণপক্ষের দিন", "আটক", "ঘরগেরস্থি", "কেউ আসেনি", "ফেরা", "মধ্যরাতের কাব্যি", "খনন", "মাটির তলার মাটি", "সম্মুখে শান্তি পারাবার", "মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছে" ইত্যাদি গল্পের আখ্যানে খুলনার ফুলতলা ও যশোরের নোয়াপাড়া অঞ্চলের ভাষা সপ্রাণ উপস্থিত। এই অঞ্চলের ভাষার স্বর, টান ও লয় যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। বিশেষত, খুলনার প্রকৃত আঞ্চলিক ভাষার টানের চেয়ে ফুলতলা-নোয়াপাড়া অঞ্চলের টান কম। এই ভাষার সচ্ছল গতি, টান, সাবলীলতা, ও সারল্যকে হাসান আজিজুল হক অত্যন্ত পারঙ্গমতার সাথে ব্যবহার করেন। "আত্মজা ও একটি করবী গাছ" গল্পে খুলনার আঞ্চলিক ভাষার শিল্পিত ব্যবহারের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রসঙ্গে সমালোচক আবু জাফরের মন্তব্য :

> পুরোগল্পটির প্রকাশভঙ্গির অন্তর্নিহিত শক্তির মূলে রয়েছে খুলনা অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য—ইনাম, ফেকু, সুহাসকে ভাষাগত ও পরিবেশগত দিক থেকে যেন নাড়ীর বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, আঞ্চলিক ঐ ভাষার সফল ব্যবহারের কারণে চরিত্রের প্রাণময়তা আপন আপন স্বভাবের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সুযোগ করে নিয়েছে। চরিত্রগুলো এতটা জীবন্ত, এতটা বাস্তবধর্মী হত না যদি তারা তাদের আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে লেখকের কাছ থেকে কথা বলার অবাধ বা নির্বারিত এমন ছাড়পত্র না পেত। (আবু জাফর, ১৯৯৬ : ৩৭)

হাসান আজিজুল হকের "আত্মজা ও একটি করবী গাছ" গল্পের ভাষার তুলনায় "আমৃত্যু আজীবন" গল্পের ভাষা বেশি রূপকময়, ব্যঞ্জনাদীপ্ত ও রহস্যগন্ধী। এ দুটি গল্পের তুলনায় এই অঞ্চলের ভাষা নিয়ে লেখা অন্যান্য গল্পের ভাষা নিরলংকার ও সরল। "ঘের", "মা-মেয়ের সংসার" ও "ফুলি, বাঘ ও শিয়াল" গল্পের আখ্যানে খুলনার সুন্দরবনের উপকূলবর্তী মানুষের মুখের ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেছেন। এই অঞ্চলের ভাষা খুলনার ভাষার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তবে এই ভাষা অনেকটা বুনো প্রকৃতির। তবে হাসান আজিজুল হকের গল্পভাষা যেহেতু অনেকটাই নির্মিত, তাই ভাষার প্রকৃত বুনো রূপটি এতে নেই। দৃষ্টান্ত :

> তোর যতো কথা, আজরাইল লাগতিছে কি জন্যি! চল, গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরি। কামট্ হাঙরেই সাবাড় করে দেবেনে। নাহলি, চল্ জোঙ্গলে জোঙ্গলে যাই রাত্তিরে রাত্তিরে। একটা হাঁড়ি নেবানে, আমি বাঘ ডাকতে পারি। (হাসান, ১৯৯৭ : ৬০)

হাসান আজিজুল হক 'বিধবাদের কথা' গল্পে মেহেরপুর অঞ্চলের উপভাষাকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অন্যান্য গল্পের আঞ্চলিক ভাষার চেয়ে এই গল্পের ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি মেহেরপুরের ভাষার শুধুমাত্র ঘ্রাণটা এবং টানটা নিয়েছেন, এছাড়া বাকিটা প্রায় সম্পূর্ণই স্বনির্মিত। প্রমিত শব্দের আঞ্চলিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার নিতান্তই কম।

উত্তরবঙ্গের ভাষা

শিক্ষা ও কর্মসূত্রে এবং পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রে হাসান আজিজুল হক তাঁর জীবনপরিধির বেশিরভাগ অতিবাহিত করছেন উত্তরাঞ্চলের রাজশাহীতে। কিন্তু তাঁর গল্পে রাঢ়বঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার তুলনায় উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার খুব কম। তবে "সরল হিংসা", "পাতালে হাসপাতালে", "মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত", "বিলি ব্যবস্থা" "জননী", "দূরবীনের নিকট-দূর" ও "দুন্দভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে" — এর মতো শিল্পসমৃদ্ধ গল্পের বিষয় ও ভাষার জমিন হচ্ছে উত্তরাঞ্চল। "সরল হিংসা", "পাতালে হাসপাতালে" ও "জননী", এই গল্প তিনটিতে অতি অল্প রাজশাহী অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন। "দূরবীনের নিকট-দূর" ও "দুন্দভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে" রাজশাহীর আদিবাসীদের উপভাষা এবং "মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত" ও "বিলি ব্যবস্থা" গল্প দুটিতে রংপুর অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন।

রাঢ় ও দক্ষিণ অঞ্চলের তুলনায় উত্তরাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও মানুষের জীবন-বিন্যাস সম্পূর্ণ আলাদা। হাসান আজিজুল হক সশরীরে উত্তরাঞ্চলের জনপদে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেন অসহনীয় দারিদ্র্য ও অস্তিত্বের কঠিন সংগ্রাম, প্রকৃতির রুদ্র-নিষ্ঠুর রূপ, জমিনের রুক্ষ চেহারা, কর্মহীন খাদ্যহীন কঙ্কালসর্বস্ব মানুষের চলাফেরা ও জমিদার-জোতদারদের শ্রমশোষণ। তাঁর নিজের উপলব্ধি হচ্ছে, "জীবনের তাপে উত্তরাঞ্চলের মাটি কাঁপছে।" (হাসান, ১৯৮৬ : ২০) উত্তরাঞ্চলকে বিষয় করে লেখা প্রত্যেকটি গল্পের প্রধান চরিত্র নিম্নশ্রেণির ভূমিহীন কৃষক, না হয় একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণির। প্রত্যেকটি চরিত্রের ভাষার গঠন তাদের জীবনেরই অনুরূপ। ভাষাই তাদের প্রতিবাদের শক্তিশালী অস্ত্র। শোষিত অসহায় মানুষের জন্য ভাষা যে কত শক্তিশালী প্রতিবাদের অস্ত্র হতে পারে তার প্রমাণ "দূরবীনের নিকট-দূর" গল্পের আদিবাসী যুবক দূরবীন, "মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত" একামতউল্লা, "বিলি ব্যবস্থা" গল্পের নেক বখ্‌শের ভাষা। তারা যখন প্রভুতুল্য শোষকের মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন তাদের ভাষা শাণিত তরবারির মতো ধারালো, গতিমান, তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে। শোষকের ভিত কেঁপে ওঠে। "বিলি ব্যবস্থা" গল্পের নেক বখশ ন্যায়বিচারের দাবি তোলায় জোতদারের কৌশল, ছল ও ক্ষমতার ভিত নড়বড়ে হয়ে ওঠে।

তুমি তো জেনা করো নাই, পেট-ফুলানি বুন লইয়া বাড়িটা দোজখ করার কি কাম, দোজখে যাইবারই বা কি কাম। নেক বখশ এইবার একবার ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে, আমার বুন কি করিছে মালিক, কথাই তো কহিবার পারে না, আপনার ছোঁয়া — মালিকের আর সহ্য হয় না, মোর ছোঁয়ার নাম আর একবার মুখে আনিবি তো তোর কল্লা ধর থাকি নামি দেউম শালা। (হাসান, ১৯৯৭ : ৩৭)

হাসান আজিজুল হক রাঢ়বঙ্গের ভাষা ব্যবহারে যতটা সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত সেই তুলনায় উত্তরাঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে ততটা সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত নন। এমনকি দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সাবলীল ও প্রগলভ। এই অঞ্চলের ভাষা অনেকটাই লেখকের আরোপিত এবং অনেকক্ষেত্রে স্বনির্মিত বলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরোপিত ও স্বনির্মিত হলেও ভাষার আঞ্চলিক ঐতিহ্য বজায় আছে। রাঢ়বঙ্গের ভাষার

তীক্ষ্ণ স্বরটি পর্যন্ত তিনি ধরতে পারেন কিন্তু উত্তরাঞ্চলের ভাষার ক্ষেত্রে মোটাদাগে গড়পরতা একটি আঞ্চলিক রূপ ব্যবহার করেছেন। রাঢ়বঙ্গের ভাষায় যতটা রূপক-অলংকারের ব্যবহার তিনি করেন, উত্তরাঞ্চলের ভাষার ক্ষেত্রে ব্যবহার ততটাই কম। বস্তুত, তিনি উত্তরাঞ্চলের ভাষার গভীরে প্রবেশ না করে বরং রাঢ়ের ভাষার ধাঁচটাকেই ব্যবহার করেছেন। ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও দুই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কঠিন অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং শোষকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধরন প্রায় এক। তাই রাঢ়ের ভাষার ধাঁচটি উত্তরাঞ্চলের ভাষায় ব্যবহার করে শোষক-শোষিতের সংগ্রামকে শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন তিনি।

উপসংহার

হাসান আজিজুল হকের গল্প-উপন্যাসের আখ্যানের প্রধান শক্তি মানভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার বুনন-নৈপুণ্য। সরল-সহজ-প্রাঞ্জল, গতিময়, ব্যঞ্জনাপূর্ণ, বিষয়ানুগ, চরিত্রানুগ, ব্যক্তিত্বের দ্যোতক ইত্যাদি বিশেষণ হাসান আজিজুল হকের গল্পভাষায় প্রয়োগ করা যায় প্রথম পাঠেই। তাঁর লেখায় ভাষা, বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা সমার্থক হয়ে ওঠে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মতো তাঁর ভাষাও নিরন্তর পরিবর্তন ও পর্বান্তরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার বয়ান-দক্ষতা ও বিষয়নিষ্ঠা তাঁর গল্পভাষাকে অনন্য মাত্রা দান করে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

আবু জাফর (১৯৯৬)। *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কমলকুমার মজুমদার (১৩৮৫)। *অন্তর্জলী যাত্রা*। সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

কায়েস আহমেদ (২০১১)। *সাক্ষাৎকার। উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা* [সম্পা. হায়াৎ মামুদ] ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ৫৯-৬৭

দেবেশ রায় (২০০৩)। *উপন্যাস নিয়ে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় (২০১২)। 'হাসান ভাই : আমার যে ডাকতে ভাল লাগে'। "গল্পকথা", হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, রাজশাহী, পৃ. ৪৩-৪৬

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৯)। 'আগুনপাখি'। "মহাযান", উত্তর ২৪ পরগনা, পৃ. ৭-১৫

শিবলী নোমান ও সৌভিক রেজা (২০১১)। *সাক্ষাৎকার। উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা* [সম্পা. হায়াৎ মামুদ] ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ২৪৩-২৫২

শহীদুল ইসলাম রিপন (২০১১)। *সাক্ষাৎকার। উন্মোচিত হাসান : হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা* [সম্পা. হায়াৎ মামুদ] ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা। পৃ. ২১১-২১৮

শচীন দাশ (২০১২)। 'হাসান আজিজুল হক-এর আখ্যানভূমি'। "গল্পকথা", হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, রাজশাহী, পৃ. ৬০-৬৫

সনৎকুমার সাহা (১৩৯৫)। 'হাসান আজিজুল হক : ফিরে দেখা'। "বিজ্ঞাপন পর্ব", হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, কলকাতা, পৃ. ৯৫-১১২

সুশীল সাহা (২০১২)। 'সেই সুর বাজে মনে অকারণে'। "গল্পকথা", হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, রাজশাহী, পৃ. ৩০১-৩২৫

হাসান আজিজুল হক (১৯৭৩)। *জীবন ঘষে আগুন*। খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা।
হাসান আজিজুল হক (১৯৭৫)। *নামহীন গোত্রহীন*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
হাসান আজিজুল হক (১৯৮৬)। *চালচিত্রের খুঁটিনাটি*। মুক্তধারা, ঢাকা।
হাসান আজিজুল হক (১৯৯৭)। *মা-মেয়ের সংসার*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
হাসান আজিজুল হক (২০০৬)। *আগুনপাখি*। সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা।